কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

সঞ্জয় কর ও উত্তম ভট্টাচার্য

মুখবন্ধ

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কৌটিলিয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ বইটি নিয়ে আলোচনার প্রথমেই মনে রাখতে হবে, এই বই বা পুঁথিকে আমাদের জানা আধুনিক প্রচলিত 'অর্থশাস্ত্র' বা অর্থনীতি (Economics) সংক্রান্ত বই বা পুঁথি বলা যায় না। দেশের 'সম্পদ'-এর বিকাশ এবং বন্টন, উৎপাদন ও ভোক্তার সম্পর্ক, উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধন, বাজার অর্থনীতি ইত্যাদি ইত্যাদি ধারণা সংক্রান্ত কোনো প্রাচীন জ্ঞানের নিদর্শন নয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মূলত প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি, রাজনীতি ও সম্পদ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান। মূল বইয়ের মধ্যে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এইভাবে — "মানুষের বৃত্তি বা জীবিকাকে 'অর্থ' বলা যায়, মনুষ্যযুক্ত ভূমির নামও 'অর্থ' হয়। যে শাস্ত্র সেই পৃথিবীর লাভ ও পালনের উপায় নিরূপণ করে, তাহার নাম অর্থশাস্ত্র" [বসাক, ১৯৫১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৬০]। আরও বলা হয়েছে, "এই অর্থশাস্ত্র (লোকের মনে) ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রবৃত্তি ঘটায় ও ইহাদের রক্ষা বিধান করে এবং অর্থের বিরোধী অধর্ম্মসমূহের নাশ করিয়া থাকে" [ঐ, পৃঃ ২৬২]।

অধ্যাপক কীথ (Keith) (1928)-এর কথায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হল 'Science of Politics and Practical life.' আবার অধ্যাপক রঙ্গরাজন (Rangarajan) (1987)-এর কথায় এটি, 'Art of government in its widest sense.' ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক (১৯৫০) যিনি প্রথম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদ করেন তাঁর কাছে এটি প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। এখানে রাজার পালনীয় কর্তব্য-বিধি, বৈদেশিক নীতি, রাজস্ব নীতি, শুল্ক নীতি, যুদ্ধ নীতি ইত্যাদি নানান বিষয়ে আলোচনা আছে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে (খ্রিঃ পূঃ ৩২১-৩১৮ সন নাগাদ) কৌটিল্য তথা চাণক্য তথা বিষ্ণুগুপ্ত এই ভাষ্য রচনা করেন। এ কথা বলা হয় না যে এটি সম্পূর্ণ তাঁর দ্বারাই রচিত। প্রচলিত বিধির বিপ্রতিপত্তি বা বিরোধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে চাণক্য 'সূত্র করিয়া ভাষ্য রচনা করেন'।

আবিষ্কৃত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বই-এ ১৫টি অধিকরণ বা (রাষ্ট্র)শাসন কার্যের বিভাগ আছে। সেখানে ১৫০টি অধ্যায়ে ১৮০টি প্রকরণ বা বিধির উল্লেখ আছে এবং প্রায় ছয় (৬) হাজার শ্লোক রচনা করা আছে। সময় ও কালের প্রেক্ষিতে কিছু

কিছু শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যায় বিতর্ক আছে। সম্যক অর্থবোধের জন্য নানান টীকা ও ব্যাখ্যা আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনার আগে একটা বিষয় মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের হস্তাক্ষরে তালপাতায় লেখা পুঁথি সম্পূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। ১৯০৯ সালে মহীশূরের পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রীর কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্রের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পুর্বে পণ্ডিতরা এই শাস্ত্রের নামমাত্র অবগত ছিলেন। প্রাচীন নানা সংস্কৃত গ্রন্থে অর্থশাস্ত্রের কিছু কিছু উল্লেখ ছিল মাত্র। এই গ্রন্থ উদ্ধার পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই বিশাল অর্থশাস্ত্রের যথার্থ পঠন-পাঠন দুরূহ কাজ ও শুদ্ধ ব্যাখ্যা বা টীকা তর্কাতীত নয়। শ্রী মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২০১৪) বই-এ উল্লেখ আছে যে 'তালপাতায় লেখা অর্থশাস্ত্রের একটি সম্পূর্ণ পুঁথি রক্ষিত আছে মহীশূর গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে।' (পৃঃ ৫৩) এছাড়াও 'উত্তর গুজরাটের পাটনে জৈন ভাণ্ডারে অর্থশাস্ত্রের একটি তাল পাতার খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া যায়।' 'ত্রিবান্দ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-পুঁথি সংগ্রহালয়ে, মালয়ালাম অক্ষরে লিখিত অর্থশাস্ত্রের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি রক্ষিত ছিল যা থেকে গণপতি শাস্ত্রী তাঁর সম্পাদিত অর্থশাস্ত্রের ত্রিবান্দ্রাম সংস্করণ প্রকাশ করেন' (তথ্যসূত্র —ঐ)। কোনো পুঁথিতেই পুঁথি লেখকের নাম বা পুঁথি লেখার সন তারিখ বা অন্য কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রীর অনুমান মহীশূরে রক্ষিত পুঁথি আনুমানিক সপ্তদশ-অষ্টাদশ খ্রীঃ লেখা।

এখানে আমরা আমাদের কথা প্রধানত চার ভাগে বলার চেষ্টা করব। প্রথম ভাগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রথম যিনি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন সেই পণ্ডিত রাধাগোবিন্দ বসাক সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা হবে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, যা নাকি প্রায় দু-আড়াই হাজার বছর পূর্বে রচিত, বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলা হয়েছে লেখার শেষ অংশে।

বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রধান মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্য বা বিষ্ণু গুপ্ত ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক নীতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো ব্যবস্থা নিয়ে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে অর্থশাস্ত্র লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের কাছে এটি ছিলো সংবিধানের মতো, যা অনুযায়ী তিনি শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করতেন। প্রখ্যাত গবেষক ও ঐতিহাসিকেরা এই গ্রন্থটিকে বিভিন্ন আখ্যায় ভূষিত করেছেন, যেমন D.D. Kosambi বলেছেন 'The Science of Material Gain' ; A.L. Basham বলেছেন 'treatise on polity' ; Roger Boesche বলেছেন 'science of political economy' এবং Patrick Olivelle বলেছেন 'science of politics'।

গবেষকরা মনে করেন যে আনুমানিক প্রায় ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত) বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের শাসকেরা এই অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। মহীশূরের গবেষক গ্রন্থাগারিক তথা সংস্কৃত পণ্ডিত ডক্টর রুদ্রপত্ন শ্যামশাস্ত্রী (১৮৬৮-১৯৪৪) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তালপাতার উপর সংস্কৃতে লেখা অর্থশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ১৯০৯ সালে প্রথম কৌটিল্যিয় অর্থশাস্ত্রের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং এটাই ছিল বইটির প্রথম প্রকাশ। এই গ্রন্থের আবিষ্কার শুধু ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শুধু তাই নয়, প্রায় ৭০০ বছর ধরে (১২০০-১৯০৫) নিখোঁজ থাকা গ্রন্থের পুনরুদ্ধার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। এর আগে শুধুমাত্র কিছু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেই এটির উল্লেখ ছিল আর কিছু সংস্কৃত টিকাপঞ্জীতে এই গ্রন্থ থেকে রচনা বিশেষের কথা মানুষ জানত। গ্রন্থটির ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে এবং এর পর গ্রন্থটি সারা পৃথিবীব্যাপী বহু ভাষায় অনুবাদিত ও চর্চিত হয়েছে।

অর্থশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদের গুরুত্ব

দীর্ঘদিন অধ্যাপনা ও গবেষণার পর কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত, ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই অতি প্রাচীন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাংলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সেইমতো তিনি কঠিন পরিশ্রমের পর ১৮ই আগষ্ট, ১৯৫০ সালে (১লা ভাদ্র ১৩৫৭), কৌটিলিয় অর্থশাস্ত্রের প্রথম খণ্ড (বাংলা অনুবাদ) প্রকাশ করতে সক্ষম হন কলকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে অধ্যয়নরত ছিলেন (১৯০৫-১৯০৭) শিক্ষকদের কাছ থেকে 'অর্থশাস্ত্র' পুনরুদ্ধারের কথা শুনতেন এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপনা করার সময় গ্রন্থটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর বিদ্বৎসমাজ থেকে নানাভাবে প্রশংসা আসতে থাকে এবং সেইসঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্যও অনুরোধ আসতে থাকে; যদিও প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অনুবাদপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে ওঁর এক অধ্যাপক বন্ধু ডক্টর উপেন্দ্র নাথ ঘোষাল ঐ অনুবাদের (প্রথম খণ্ডের) গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশ করেন "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকাতে ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে। তিনি সমালোচনায় গ্রন্থটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনার পাশাপাশি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রচলিত রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক জটিল পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। সেইমতো রাধাগোবিন্দ বসাক ৫৭৮ শব্দ সম্বলিত ২২ পৃষ্ঠার পরিভাষা কোষ

(পরিশিষ্ট) সহযোগে (প্রাচীন দণ্ডনীতি ও আর্থিকনীতি বিষয়ক কয়েকটি পরিভাষিক শব্দের অভিধান, পৃষ্ঠা: ৩৩৭-৩৫৮) ১৯৫১ সালের ২৩ মার্চ (৯ই চৈত্র, ১৩৫৭) দ্বিতীয় খণ্ড (বঙ্গানুবাদ) প্রকাশ করেন ওই একই প্রকাশকের থেকে (কলকাতা জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড)। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই দুই খণ্ডের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বঙ্গানুবাদের সঙ্গে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের পাঠ সংযোজিত করার অনুরোধ আসতে থাকে বিভিন্ন মহল থেকে। শেষ পর্যন্ত ৭৯ বছর বয়সে, ১৯৬৪ সালের ১ জুলাই (১৭ই আষাঢ়, ১৩৭১) তিনি অতি তৎপরতার সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে সক্ষম হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই দ্বিভাষিক অনুবাদ গ্রন্থ পাঠকমহলে বহুলভাবে সমাদৃত হয় এবং বিক্রিও হয়। মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের, ভারততত্ত্ব বিষয়ের গবেষকদের কথা ভেবে এবং জ্ঞানপিপাসুদের সুবিধার জন্য তিনি বঙ্গানুবাদসহ মূল সংস্কৃতাংশের সহযোগে কৌটিলিয় অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন ১৯৬৭ সালের ১৫ই আগস্ট (৩০শে শ্রাবণ, ১৩৭৪)। এরপর যথাক্রমে ১৯৭০ সালে প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ এবং ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের অনূদিত বই "যে যে কৌটিল্যচরিত দেশনায়ক নিজ নিজ সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছেন, অর্থশাস্ত্রবিৎ সেই সেই পূজনীয় মহাপুরুষদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে এই গ্রন্থের উৎসর্গ করা" হয়। তাঁর মৃত্যুর পর, ভারতবর্ষ এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা বইটির চাহিদার কথা মাথায় রেখেই বইটির বিভিন্ন পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

পরবর্তীকালে (২০০৫-০৬ সালে) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতার সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার প্রকাশন থেকে দুই খণ্ডে 'কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্' মূল সংস্কৃত সহ সম্পাদনা ও অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন।

রাধাগোবিন্দ বসাক (১৮৮৫-১৯৮২)

তিনি ১৮৮৫ সালের ৮ জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা শহরের নবাবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জগমোহন বসাক এবং মাতা মনোরমা বসাক। তিনি বাল্যশিক্ষা অর্জন করেন ঐতিহ্যবাহী কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল থেকে। গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ১৯০৩ সালে আই.এ. পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি সংস্কৃত

সাহিত্য নিয়ে ওই ঢাকা কলেজেই পড়াশুনা শুরু করেন এবং ১৯০৫ সালে স্নাতক উত্তীর্ণ হন। দুই বাংলা যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল ঠিক তখন তিনি সব কিছুকে উপেক্ষা করেই কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি দেন উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল, তিনি যখন ঢাকা কলেজে পড়তেন তখন তিনি স্পেশাল পেপার হিসেবে 'অশোকের শিলালিপি' রেখেছিলেন। কিন্তু কলেজে এ বিষয়ের কোনো শিক্ষক না থাকায় তাঁকে নিয়মিত কলকাতা যেতে হতো 'এপিগ্রাফি' শেখার জন্য। কলকাতায় তিনি প্রাচীন হস্তলিপি বিজ্ঞান এবং প্রত্নলিপি বিজ্ঞানে পড়াশুনা শুরু করেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, গ্রন্থাগারিক (ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার) ও বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ড. হরিনাথ দের কাছে। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় বিখ্যাত স্কলার আচার্য ধর্মানন্দ দামোদর কোশাম্বির সঙ্গে (১৮৭৬-১৯৪৭) এবং দুজনে একইসঙ্গে ড. দে'র কাছ থেকে সম্রাট অশোক-এর শিলালিপি পাঠোদ্ধারের পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তিনি অধ্যাপক কোশাম্বির সহায়তায় পাণিনির ব্যাকরণের প্রয়োগের মাধ্যমে অশোক-এর শিলালিপিগুলির ভাষ্য সংস্কৃতে অনুবাদের চেষ্টা করেন। যাই হোক তিনি ১৯০৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এই সফলতার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'সোনামণি স্মৃতি' পুরস্কার প্রদান করে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর পর ড. দে'র (মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, ১৯১১) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন এবং ওঁর কাছে গবেষণাকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৮-১৯, ১৯৩৩-৪১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১-৩৩), ও প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৯৩৩-৪১) শিক্ষকতা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে যোগদান করেন যখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৯৩১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন।

রাজশাহী জেলাতে গড়ে ওঠা Varendra Research Society (১৯১০)-এর জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং ১৯১৪ সালে রাজশাহী কলেজে পড়ানোর পাশাপাশি সাম্মানিক গ্রন্থাগারিক হিসেবে মিউজিয়ামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন এবং গবেষকদের সুবিধার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট শরৎ কুমার রায় এবং অন্যান্য মেম্বারদের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন ভাস্কর্য, পুরাকীর্তি, মুদ্রা, লিপি ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির যথাযথ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করতে থাকেন। এইভাবেই তিনি সোসাইটির লাইব্রেরি তথা মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করে তোলেন এবং ক্রমেই এটি গবেষণার অন্যতম তথ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে নিয়ে রাজশাহীতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির একটি ক্যাটালগ তৈরি করেন যা গবেষক মহলে প্রবল সাড়া ফেলে এবং গবেষণার

অন্যতম তথ্যসূত্র হয়ে দাঁড়ায়। VRS সোসাইটির প্রেসিডেন্ট তথা বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়র সান্নিধ্যে আসাও তাঁর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা ও শিক্ষকতা করলেও, প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল এবং তিনি আজীবন ইতিহাস চর্চা করে গেছেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জী ১৯১৮ সালে নিজ উদ্যোগে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগে লেকচারার হিসেবে নিয়োগ করেন 'এপিগ্রাফি' পড়ানোর জন্য। সেখানে তিনি প্রায় এক বছর বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ডি. আর. ভান্ডারকারের সঙ্গে অশোকের লিপিসহ অন্যান্য লিপির পাঠদান করেন।

তাঁর গবেষণাকর্মে অনবদ্য অবদানের জন্য কলকাতার সংস্কৃত কলেজ তাঁকে ১৯৬৩ সালে সম্মানসূচক 'বিদ্যাবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করে এবং ১৯৭২ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. ডিগ্রি প্রদান করে সম্মানিত করে। সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য তাঁকে ১৯৬৫ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, রাষ্ট্রপতি পদক ও প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। গবেষণাক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের জন্য কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৬৭ সালে তাঁকে ফেলো হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৮০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি স্মারক (Tagore Plaque) প্রদান করে। তিনি ১৯৫০ সালে 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। এখনও পর্যন্ত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের এটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ। ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর, ৯৭ বছর বয়সে এই বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতের জীবনাবসান হয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রর বিষয়বস্তু ও তার বিন্যাস

আমরা আগেই দেখেছ যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পুঁথির মূল বিষয় রাজনীতি ও রাজ্যশাসন বা রাষ্ট্রশাসনকার্য পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে কিছু বিধি বিধান। প্রাচীন এই পুঁথি এখনও পর্যন্ত যতটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে দেখা গেছে সেখানে পনরোটি (১৫) অধিকরণে বা বিভাগে (Section) সর্বমোট ১৫০টি অধ্যায়ে রাজনীতি ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ১৮০টি (প্রকরণ বা ভেদ) সূত্রে ভাষ্য রচনা করা আছে। যেসব বিষয়ের সেখানে উল্লেখ আছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরলে আলোচনার সুবিধা হবে। রঙ্গরাজন (১৯৯০) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রর বিষয়বস্তুকে মোটামুটি দশ ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হল — (১) রাষ্ট্র এবং তার গঠন বিষয়ে কথা (২) রাজার কাজ বা কর্তব্য (৩) সুসংগঠিত রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায় (৪) ট্রেজারি বা কোষাগার সংক্রান্ত বিষয়, রাজস্ব আহরণ হিসাব সংরক্ষণ ও পরীক্ষণ বিষয় (৫) সরকারি বা রাষ্ট্রের কর্মচারি বিষয়ে নিয়ম কানুন বা অমাত্য নিয়োগ বিচারে নিয়ম আচার (৬) প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা (৭) আইন ও নীতি বিষয়ে চর্চা (৮) গোপন বা ছদ্ম

কর্ম (৯) বৈদেশিক নীতি (১০) দেশের প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা। আরও সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথম পাঁচ অংশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন সংক্রান্ত ও বাকি অংশ মূলত পড়শী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কিছু কথা প্রবাদ বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন —রাজার কর্তব্য বিষয়ে প্রথম অধিকরণের ঊনবিংশ অধ্যায়ে আছে, রাজা যদি উদ্যোগী হন (বা উত্থানযুক্ত হন), তাহলে ভৃত্যবর্গও উদ্যোগী হন। রাজা যদি প্রমাদযুক্ত হন তাহলে ভৃত্যবর্গও প্রমাদী হয়।' প্রথম অধিকরণের উনিশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে,

প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্।। (১-১৯-৫)

অর্থাৎ "প্রজার সুখ উপস্থিত হইলেই রাজার সুখ হয় এবং প্রজার হিত হইলেই তাহা রাজার হিত বলিয়া বিবেচ্য। যা রাজার নিজের প্রিয় তা তাঁহার হিত নয়, কিন্তু প্রজাবর্গের যা হিত তা রাজার হিত।"

অথবা দ্বিতীয় অধিকরণে (অধ্যক্ষ বিষয়ে) নবম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে — রাজকর্মচারীদের অর্থহরণ রাজার কাছে কেমন দুর্জ্ঞেয় :

মৎস্যা যথাহন্তঃ সলিলে চরন্তো।
জ্ঞাতুং ন শক্যাঃ সলিলং পিবন্তঃ।। (২-৯-৭)

অর্থাৎ "মাছ জলের মধ্যে বিচরণ করতে করতে জলপান করলে যেমন অন্যের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়, তেমন রাজার অর্থবিষয়ক কার্যব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তির ধন অপহরণ জানা সম্ভব নয়।'

আরও বলা আছে, আকাশে পক্ষীর গতি হয়তো জানা সম্ভব কিন্তু রাজার অর্থবিষয় তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ব্যক্তির গোপনে অর্থ অপহরণের কাজ অনুধাবন করা অসম্ভব। রাষ্ট্র উন্নয়নে এবং শত্রুজয় বা শত্রু স্ববশে আনতে কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে সাম (সমঝানো বা বোঝানো বা সন্ধি স্থাপন)-দান/দাম-দণ্ড-ভেদ — এই চার নীতি বা প্রকরণের সম্মিলিতভাবে বা পৃথকভাবে প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনা বা শত্রুদমনে এই সাম-দান-ভেদ-দণ্ড নীতি প্রয়োগ এখন আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে।

এখন আমরা আরও একটু বিস্তারিতভাবে পনরোটি (১৫) ভাগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কী কী বিষয়ে আলোচনা আছে তা উল্লেখ করি।

প্রথম অধিকরণ : 'বিনয়াধিকারিক' বা শিক্ষাবিষয়ক : (অর্থাৎ রাজার বিনয় ও বিদ্যাদিশিক্ষার প্রস্তাব-যুক্ত) এখানে মোট একুশটি অধ্যায় ও ১৮টি প্রকরণ আছে। এখানে রাজবৃত্তি, ইন্দ্রিয় জয়, অমাত্য নিয়োগ, আত্মরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় অধিকরণ : 'অধ্যক্ষপ্রচার' (অর্থাৎ বিভিন্ন শাসনবিভাগের অধ্যক্ষগণের

কর্তব্যাদিনির্ণয়-যুক্ত)। এখানে ৩৮টি প্রকরণ ও মোট ৩৬টি অধ্যায় আছে, যেমন — জনপদ বিষয়ে, দুর্গ রচনা বিষয়ে (বিভিন্ন প্রকার দুর্গ যেমন — নদীবেষ্টিত দুর্গ, বনবেষ্টিত দুর্গ, ঊষর দুর্গ), কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বা সীতাধ্যক্ষ বিষয়ে, শুল্ক বিষয়ে, নাগরিক কর্তব্য বিষয়ে (যেমন আগুন হতে বাসস্থান সুরক্ষা), সমাহর্তা বা মহামাত্র বা প্রশাসক বিষয়ে, মুদ্রাধ্যক্ষ বিষয়ে, দেশে প্রবেশ ও নির্গমন বিষয়ে, এমনকি গণিকা বিষয়েও।

তৃতীয় অধিকরণ : 'ধর্ম্মস্থীয়' (অর্থাৎ দেওয়ানী-আদালত-সম্পর্কীয় ব্যবহার স্থাপনা-যুক্ত)। এখানে ২০টি অধ্যায় আছে ও মোট ১৯টি প্রকরণ আছে। যেমন — বিবাহ সম্পর্কিত, দ্যূত ক্রীড়া, সম্পত্তি ভাগ বিষয়ে, ঋণ গ্রহণ বিষয়ে, দণ্ডবিধি বিষয়ে আলোচনা আছে।

চতুর্থ অধিকরণ : 'কন্টক-শোধন' (অর্থাৎ ফৌজদারী-সম্পর্কীয় ব্যবহারে সমাজের কন্টক বা উপদ্রবকারীদের শাস্তি বিধি-যুক্ত)। এখানে ১৩টি অধ্যায় ও ১৩টি প্রকরণ আছে। এখানে প্রজাবর্গের রক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। বর্ণনা আছে অসৎ বৈদ্য এবং ব্যবসায়ীদের থেকে সাবধান হওয়ার কথা।

পঞ্চম অধিকরণ : 'যোগবৃত্ত' (অর্থাৎ গূঢ়পুরুষাদি-কর্তৃক উপাংশুবধাদির [গুপ্তপুরুষের দ্বারা গুপ্তহত্যাদি] প্রয়োগ-যুক্ত)। এখানে ছয়টি অধ্যায়, সাতটি প্রকরণ আছে। যেমন — দণ্ড প্রয়োগ, কোষ সংগ্রহ, ভৃত্যদিগের ভরণ, সময়বিশেষ আচরণ, কীভাবে রাজা খারাপ অমাত্য থেকে সাবধান হতে পারে তার উল্লেখ।

ষষ্ঠ অধিকরণ : 'মণ্ডলযোনি' (অর্থাৎ দ্বাদশ-রাজমণ্ডলের চিন্তাবিষয়ক)। এখানে দুইটি প্রকরণ ও দুইটি অধ্যায় আছে। এখানে রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, দণ্ড ও মিত্র — রাজ্যের এই সাত অঙ্গ বা প্রকৃতি গুণ সম্পর্ক বিষয়ে, তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আছে।

সপ্তম অধিকরণ : 'ষাড়্গুণ্য' (অর্থাৎ সন্ধিপ্রভৃতি ছয়টি গুণের প্রতিপাদন-যুক্ত)। : এখানে ১৮টি অধ্যায় ও ২৯টি প্রকরণ আছে। ষাড়্গুণ্য অর্থ — সন্ধি, বিগ্রহ, আসন বা উপেক্ষা, যান, সংশ্রয়, দ্বৈধীভাব (সন্ধি ও বিগ্রহের উপযোগ বা একই শত্রুর সাথে সন্ধি ও প্রচ্ছন্ন দ্রোহাচারণ) — এই ছয়টি রাজনীতি বিষয়ক গুণ। এইসব গুণ অবলম্বনে রাজা ও তার রাজ্যের শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধি কীভাবে ঘটবে তার আলোচনা আছে। রাজার কতকগুলি বিশেষ গুণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা আছে।

অষ্টম অধিকরণ : 'ব্যসনাধিকারিক' (অর্থাৎ সপ্তাঙ্গ রাজ্যের বিপদের ও সঙ্কটের আলোচনা-বিষয়ক)। এখানে রাজা ও রাজ্যের নানা ধরনের বিপত্তি চিন্তা ও তা নিরূপণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা আছে। এখানে আটটি প্রকরণ ও পাঁচটি অধ্যায় আছে। রাজা, জনগণ, মিত্র, সৈন্যগণের বিপত্তি নিরূপণ বিষয়ে আলোচনা আছে। আগুন ও জল ইতি বিপদ, পাশা খেলা, নারী ও পানীয় হতে বিপদের কথা আছে।

নবম অধিকরণ : 'অভিযাস্যৎকর্ম্ম' (অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার শত্রুর প্রতি

অভিযান-সম্বন্ধীয়)। এখানে বারোটি প্রকরণের নাম আছে এবং সাতটি অধ্যায় আছে। শক্তি, দেশ ও কালের বলাবল জ্ঞান, যাত্রার কাল নির্ণয়, সেনার উপাদানকাল, দূষ্য ও শত্রু দ্বারা উৎপাদিত আপদ, বাহ্য ও অভ্যন্তর ও অন্য নানা আপদ নিরূপণ সংক্রান্ত আলোচনা আছে। লাভ-লোকসানের বিভিন্ন ধরন আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সৈন্যদের উৎসাহ দেবার পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

দশম অধিকরণ : 'সাংগ্রামিক' (অর্থাৎ সংগ্রাম-বিষয়ক আলোচনা-যুক্ত) : এখানে ১৩টি প্রকরণ ও ৬টি অধ্যায় আছে। এই ভাগে সেনাবাসস্থান, সেনারক্ষা, যুদ্ধযোগ্য ভূমি ও অশ্ব, রথ, হস্তী, পদাতিক ইত্যাদির যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য নিরূপণ বিষয়ে আলোচনা আছে। অর্থাৎ অন্য দেশ বিজয় অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যূহ রচনা ও নানা বিষয়ে কথা আছে।

একাদশ অধিকরণ : 'সংঘবৃত্ত' (অর্থাৎ সংঘ বা শ্রেণী প্রভৃতির প্রতি বিজিগীষুর আচরণ-সম্বন্ধীয়)। এখানে একটি মাত্র অধ্যায় আছে ও দুটি প্রকরণের কথা আছে। অনুকূল মানুষদের একত্রীকরণ ও প্রতিকূলচারীদের বিভেদ করা, দণ্ড দেওয়ার পরামর্শ আছে। সংঘবদ্ধ করার নানা পন্থার কথা আছে। রাজাবিরুদ্ধ অমাত্যদের কীভাবে পরাজিত করতে হয় তা বলা আছে।

দ্বাদশ অধিকরণ : 'আবলীয়স' (অর্থাৎ অবলীয়ান্ বা দুর্বলতর বিজিগীষুর করণীয়-যুক্ত)। এখানে পাঁচটি অধ্যায় আছে এবং নয়টি প্রকরণের উল্লেখ আছে। এই ভাগে বিজয় উৎসাহী 'দুর্বল' রাজার কিছু উল্লেখযোগ্য করণীয় বিষয়ে আলোচনা আছে। এখানে উল্লেখ আছে যে, আক্রমণকারী রাজা তিন ধরনের —

(১) ধর্ম বিজয়ী, যিনি আত্মসমর্পণে তুষ্ট।

(২) লোভ বিজয়ী, যিনি শত্রুর ভূমি ও দ্রব্য হরণে তুষ্ট।

(৩) অসুর বিজয়ী, যিনি শত্রুর ভূমি, দ্রব্য, পুত্র ও দার সহ প্রাণহরণে তুষ্ট হন। এসব ক্ষেত্রে কিছু করণীয় চর্চা করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধিকরণ : 'দুর্গলম্ভোপায়' (অর্থাৎ শত্রুদুর্গের লাভোপায়-সম্বন্ধীয়)। এখানে পাঁচটি অধ্যায় ও ছয় প্রকরণের উল্লেখ আছে। এখানেও মূলত দেশ রক্ষা এবং দেশ বিজয় বিষয়ে কিছু বিধান আছে। শত্রুর থেকে নিজপক্ষীয়দের আলাদা করা যোগবামন বা কপট উপায়ে কীভাবে দুর্গ থেকে শত্রু বিতাড়ন করা যায়, 'গূঢ়পুরুষ' বা গুপ্তচরকে কীভাবে রাজকার্যে ব্যবহার করা যায়, কীভাবে শত্রুপক্ষের দুর্গ গ্রহণ করা যায়, কী পদ্ধতিতে লাভপ্রাপ্ত পরবর্তীকালে বিজিত ভূমিতে শান্তিস্থাপন বা 'লব্ধ প্রশমন' করা যায় ইত্যাদি উপদেশ আছে। দুর্গ বলতে এখানে বলা হয়েছে বন, স্থল, জল, শুষ্ক ও ঊষর স্থান। বিজিত দেশবাসীর প্রতি নানা সদয় ব্যবহারের কথাও আছে।

চতুর্দশ অধিকরণ : 'ঔপনিষদ' (অর্থাৎ পরোক্ষভাবে শত্রুজয়ের উপায়-রহস্যের

কথা বিষয়ক)। এখানে মোট চার অধ্যায় তিন প্রকরণের নাম বলা আছে, যথা — শত্রুঘাতের উপায় প্রয়োগ, শত্রুর প্রলম্ভবন বা প্রবঞ্চন করার পদ্ধতি, স্ব সেনার ওপর শত্রুর নানা ধরনের বিষপ্রয়োগ (উপঘাত)-এর প্রতিকার বিষয়ে চর্চা করা হয়েছে এখানে।

পঞ্চদশ অধিকরণ : তন্ত্রযুক্তি। অর্থশাস্ত্রে প্রচলিত ৩২ প্রকারের ব্যাখ্যান ও ন্যায়-বিষয়ক কথা। এ অধিকরণে মাত্র একটি অধ্যায় ও একটি প্রকরণের ব্যাখ্যা (১৮০ তম ভেদ) আছে। এটি এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত বা জ্ঞাত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের শেষ অধিকরণ। অর্থশাস্ত্রের আদি থেকে ১৫০ অধ্যায়ের সমাপ্তি এখানেই। এখানে অর্থশাস্ত্ররূপ তন্ত্রের অর্থনির্ণয়ের যুক্তির ব্যাখ্যা আছে। এখানেই বলা হয়েছে, যে শাস্ত্র পৃথিবীর সম্পদ লাভ ও পালনের উপায় নিরূপণ করে, তারই নাম অর্থশাস্ত্র। বলা হয়েছে এই শাস্ত্র ৩২ প্রকার যুক্তির দ্বারা যুক্ত, যেমন — প্রধান অর্থ বিষয়, অনুবর্তী বিষয়, হেতু বিষয়, উদ্দেশ বা সংক্ষিপ্ত বাক্য, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ (অন্যদের কথা), অতিদেশ (অনুক্ত কথা), একান্ত (বা যা সর্বদেশ ও সর্বকালে প্রযোজ্য), সমুচ্চয় (নানা পদ্ধতিতে একই কাজ করা) উহ্য বা অনুক্ত কথার উক্তি করা। কৌটিল্যের মতে 'এই অর্থশাস্ত্র মানুষের মনে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের প্রবৃত্তি ঘটায় এবং তাদের রক্ষা বিধান করে এবং সেইসঙ্গে অর্থের বিরোধী সমস্ত অধর্মকে নাশ করে।'

বর্তমান সমাজ ও অর্থনীতিতে কৌটিল্য এবং তাঁর অর্থশাস্ত্রর গুরুত্ব

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য এই অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। রাধাগোবিন্দ বসাক (১৯৫০)-এর কথায় "মহীপতিত্বের আকাঙ্ক্ষী যে-কোন বিজিগীষুর (শত্রুকে বিজিত করিতে অভিলাষী রাজার) পক্ষে যেরূপ আদর্শ শাসনপ্রণালী ও ব্যবহারপদ্ধতির প্রচলন করা আবশ্যক তাহা — এই উভয়বিধ অবস্থা উদ্দেশ্য করিয়াই তিনি (কৌটিল্য) নিজ রচিত অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিবিধ বিষয়ের অবতারণা ও মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন।" (বসাক : অবতরণিকা শেষ অনুচ্ছেদ)

প্রাচীন ভারতে রাজ্যশাসন কীভাবে পরিচালিত হতো, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন কেমন ছিল, অর্থনৈতিক কাজকর্ম, রাজস্ব ও শুল্ক ব্যবস্থা কেমন ছিল ইত্যাদির এক বর্ণনা পাওয়া যায়, অন্য কোনো প্রাচীন পুঁথিতে যার তত হদিস পাওয়া যায় না। কৌটিল্যের দর্শন বর্তমান কালেও প্রাসঙ্গিক কিনা এই প্রশ্নে মনে হয় অনেকেই তাঁর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একমত হবেন। রঙ্গরাজন (১৯৯০)-এর কথায় কিছু খুঁটিনাটি বাদ দিলে মানুষের ব্যবহার ও রাষ্ট্রের আচরণ মোটের ওপর একই আছে। সেজন্য তিনি এখনও প্রাসঙ্গিক। যুদ্ধ প্রস্তুতি বিষয়ে হয়তো তাঁর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে।

কিন্তু সেখানেও কৌটিল্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। জানা যায় "অর্থশাস্ত্র" অনেক প্রতিরক্ষা (Defence) সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অংশ বিশেষ পাঠ্য। প্রশাসন ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত প্রশ্নে কৌটিল্যের জ্ঞান এবং শিক্ষা ক্ষেত্রমতো প্রাসঙ্গিক হবে। কৌটিল্যকে কেউ কেউ বাস্তবজ্ঞান সম্মত শিক্ষক ("Teacher of Practical Statecraft") বলেই গণ্য করবেন (রঙ্গরাজন, ১৯৯০)। কারো কারো কাছে চাণক্য বা কৌটিল্য প্রাচ্যের 'নিকোলো ম্যাকিয়াভেল্লি' (Niccolo Machivelli) (১৪৬৯-১৫২৭) [ইতালির রেঁনেসা আমলে রাজনৈতিক দর্শনের পিতা, তাঁর লেখা 'The Prince', ১৫১৩ রাষ্ট্রনীতির দর্শন হিসাবে বিশেষ খ্যাত।]

কৌটিল্য 'অনৈতিক' শিক্ষক কিনা এ বিষয়ে কিছু বিতর্ক আছে। গোপনে 'অনৈতিক' পদ্ধতিতে কীভাবে অন্য দেশের রাষ্ট্রনেতাকে হত্যা করা যায়, রাজ্য দখল করা যায় ইত্যাদিতে তাঁর পরামর্শ আছে। দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বিষয়ে যে সমস্ত পরামর্শ আছে, তা সভ্য জগতে নিশ্চয়ই অনেকের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের স্বার্থরক্ষার নামে আধিপত্য বিস্তারের বিষয়ে যা বলা আছে তা একইভাবে গ্রহণ করা যায় না। তবু কৌটিল্যকে এক 'অনৈতিক' মানুষ হিসাবে দেখা এক অজ্ঞতা। তাঁর অনেক আধুনিক তথা চিরকালীন দৃষ্টি অস্বীকারের স্থান নেই। তাঁর ভারসাম্যর দিক (বা Balanced view) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৌটিল্য দর্শনের মূল কথা "মানুষের কল্যাণ ও হিত।" তাঁর দর্শনের মূলে আছে ধর্ম ও বাস্তব বুদ্ধি, রাষ্ট্রশাসন পরিচালনায় অনেক দক্ষ পরামর্শ। কেবল দোষ স্বীকার করলেই প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী না ভাবার কথা আছে। রাজা নির্বিচারে আক্রমণ করবে না, সৎ মানুষকে আক্রমণ রাজার নিজের প্রজারাই ঘৃণা করবে — সে বিষয়ে নির্দেশ আছে, শত্রু ভাল হলে তার প্রতি আরও বেশি ভাল ব্যবহার করা দরকার, রাজ্য বিজয়ের পর রাজা ধর্মমতো ব্যবহার করবে, বিজিত দেশের সংস্কৃতি ও আচার-আচরণকে সম্মান দেবে ইত্যাদি পরামর্শ আছে। তিনি একদিকে যেমন কোনো ব্যবসায়ীকেই বিশ্বাসের কথা বলেননি, (কারণ তাদের মূল চিন্তা 'লাভ' বা making money) অন্যদিকে আবার বিপদে তাদের সাহায্যের কথাও আছে। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁর অনেক শর্তসাপেক্ষ পরামর্শ আছে। শাস্তি কখন কখন কমানো উচিত সে নির্দেশও আছে।

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে কৌটিল্যকে এক কথায় ভাল বা মন্দ এ বিচার যথার্থ নয়। কিন্তু তিনি এখনও ভীষণভাবেই প্রাসঙ্গিক। শ্রীমানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র কেবল প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রশাসন সম্পর্কেই একটি অমনিবাস নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 'State craft' —সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর সঙ্গেও তুলনীয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, গণপ্রশাসন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক —যে কোনো দিক থেকে বিশ্লেষণ করলেই, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপকারিতা

ও গুরুত্ব ধরা পড়ে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সবটাই যে আজ উপযোগী তা নয়, হতে পারে না, কিন্তু অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অনেক সমস্যা ও বিষয় আজকের দিনে আরও প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র স্বকীয়, অনন্য।" (পৃঃ ৮০৬)

অনেক সময় বলা হয় "যা নেই (মহা)ভারতে, তা নেই ভারতে"। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধেও বলা যায় যে, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয় প্রায় নেই যা কৌটিল্য তাঁর শাস্ত্রে অনেক আগেই আলোচনা করে যাননি। অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু বা আলোচনার পরিধি থেকেই আমাদের কাছে স্পষ্ট যে সেখানে যে সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা রাজ্যশাসন ও দক্ষ প্রশাসনের জন্য অবশ্য-চর্চার বিষয়। এখানে বলা হয়েছে, প্রজাসমূহের হিত ও সুখ বিধানই রাজার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। দ্বিতীয় কর্তব্য, সমাজ-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা। বলা আছে, 'অর্থ বা সম্পদই একমাত্র অর্থবৃদ্ধিতে সহায়তা করে,' তা গ্রহ নক্ষত্র দিতে পারে না। বলা আছে, রাজকোষ শূন্য হতে থাকলে রাজ্যের অস্তিত্বই বিনাশ পায়। রাজার অবশ্য কর্তব্য উদ্‌বৃত্ত অর্থ সৃষ্টিতে নজর দেওয়া। রাজস্ব অর্থশাস্ত্রের অন্যতম বিষয়। রাজকোষ বৃদ্ধিতে সর্বদা বিশেষ নজর দেবে রাজা। ধনকোষ না থাকলে দেশরক্ষার জন্য সৈন্য রক্ষা সম্ভব নয়। প্রশাসন ভেঙে যায়। রাজকোষ শূন্য হলে রাজ্য বিনষ্ট হয়।

আবার এও বলা হয়েছে, রাজস্ব বৃদ্ধি হয় সহযোগিতার মাধ্যমে। এজন্য রাজার উচিত একাধিক দক্ষ মন্ত্রী বা প্রশাসক বা অধ্যক্ষ নিয়োগ করা, মতামত শোনা। তবে রাজাই হবেন প্রশাসনের প্রধান, মন্ত্রী নিযুক্ত করতে হবে তাদের যাদের সততা, দক্ষতা সম্বন্ধে রাজা সচেতন। প্রশাসনে যে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে রাজা সচেতন থাকবে। প্রশাসনিক কাঠামো বহুমাত্রিক হবে। জনস্বার্থ রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধান রাজকার্যের ভিত্তি। এখানে বলা আছে, দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা, কল্যাণ, প্রগতি নির্ভর করে দণ্ড (শাস্তি), দণ্ডনীতি (প্রশাসনিক বিধি নিষেধ) প্রণয়ন, লোক সমাজের কন্টক বা অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার রীতি নীতির উপর। যুদ্ধে রাজত্বর সীমা বাড়ানোর কথা আছে, যদিও বর্তমান সভ্য সমাজে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, রাজা প্রজাদের পিতার ন্যায় রক্ষা করবে। রাজার একমাত্র পুত্র যদি অবিনীত বা অশিক্ষিত হয়, তবে সেই পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করা উচিত নয়।

এখানে উল্লেখ আছে রাজকোষের উন্নতির জন্য রাজা কৃষকদের বীজ দান করবে ও করমুক্তির ব্যবস্থা করবে। রাজা, বাল-বৃদ্ধ-অক্ষম-অসহায়-পীড়িত মানুষদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। অর্থশাস্ত্র মতে কৃষি, গবাদি পশু, বাণিজ্য সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বার্তা বা বিদ্যা। তা শস্য সম্পদ, বনজ সমদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অর্থনীতি ও অর্থসম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় এই অর্থশাস্ত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এছাড়া অর্থশাস্ত্রে নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা আছে। নাগরিকের কর্তব্য, অগ্নি হতে সুরক্ষা, নগরে স্বাস্থ্য বিষয়ে, জল নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী বিষয়ে নজর রাখার কথা আছে।

এখানে নারীদের সম্পত্তির অধিকার, নারীদের বয়ন বা তন্তুবায় শিল্পে নিযুক্ত থাকার কথা আছে। স্বামী খারাপ চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, জাতিচ্যুত হলে নারীর পুনর্বিবাহের অনুমতি আছে। ক্ষেত্রমত বিধবা বিবাহের কথা আছে। পুত্র ও কন্যার সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত আছে। ক্রীতদাসের নিজের উপার্জন ভোগ করার অধিকারের কথা আছে।

পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কথা আছে। ক্ষতিকারকদের শাস্তি বিধানের কথা আছে। চিকিৎসকের অবহেলা বা অযত্নে মৃত্যু হলে শাস্তির কথা আছে। ক্রেতা সুরক্ষার কথা আছে। পরিমাপে ও বস্তুগুণে অনিয়ম থাকলে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আছে। রাজা বা স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, দণ্ড ও মিত্র — এ নিয়ে রাজ্যের সপ্তাঙ্গ। প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তিতে শক্তিমান স্বামী বা রাজাই কেন্দ্রীয় রূপ। রাজার ষোলটি গুণের কথা আছে, সেগুলি হল — রাজা মহাকুলীন বা উচ্চ কুলের হবে, দৈব্যসম্পন্ন হবে, বুদ্ধিসম্পন্ন হবে, সত্ত্বসম্পন্ন হবে বা ধৈর্যযুক্ত হবে, বৃদ্ধদর্শী বা অভিজ্ঞজনের মতগ্রহণকারী হবে, ধার্মিক হবে, সত্যবাক হবে, কৃতজ্ঞবান হবে ইত্যাদি।

অর্থশাস্ত্রে অর্থ-সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক জীবন, পরিমাপ ব্যবস্থা, নগর ও গ্রামের প্রশাসন, সুরক্ষা, সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষ জনের কথা, রাষ্ট্রচিন্তা, ভূমি-ব্যবস্থা, অধিকার, কর্তব্য, যুদ্ধ ইত্যাদি কীই বা আলোচনা নেই এই শাস্ত্রবিদ্যায় ! এজন্য বলা যায় কৌটিল্যের প্রাচীন এই অর্থশাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। বিদ্যাচর্চায় এই অর্থশাস্ত্র, এক প্রয়োজনীয় পাঠ্যশাস্ত্র হিসাবে আজও মান্যতা পায়।

এখন আমরা আমাদের কথা শেষ করব রাধাগোবিন্দ বসাক (১৯৫০)-এর বক্তব্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন, "ভারতের শাসন ও রক্ষাকার্য্যে যাঁহারা এখন ব্রতী ও দেশের সবগুলি প্রদেশে (বিশেষতঃ বাঙ্গালা প্রদেশে) যাঁহারা মন্ত্রীপদে আরূঢ়, তাঁহাদেরও নিজদেশে প্রাচীনকালে প্রচলিত ও প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক গ্রন্থের সহিত সবিশেষ পরিচয় থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রাচীন রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল তাহা না জানা থাকিলে, দেশের সভ্যতা, ভব্যতা, ও কৃষ্টি রক্ষা দুষ্কর কার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।" (মুখবন্ধ) আরও বলেছেন, "প্রাচীন রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনা ও প্রচারবিষয়ে সামাজিকগণের মন ইহা পাঠ করিয়া যদি একটুও পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হয়, তাহা হইলেই আমার (এই সুপ্রাচীন দুরূহ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ প্রয়াস) পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে।" (বসাক, ১৯৫০ মুখবন্ধ)

তথ্যসূত্র :

১। রাধাগোবিন্দ বসাক, (১৯৫০, ১৯৫১) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড।

২। মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক (২০০৫) (২০১০) কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (দুই খণ্ড), ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০১৪, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

৩। Kangle, R. P. (1969), The Kautilyan Arthashastra, Second Edition, University of Bombay, Mumbai.

৪। Keith, A. B. (1928) : A History of Sanskrit Literature, Oxford Clarendon Press, 1928, Ch-23, pp.450-466

৫। Rangarajan, L. N. (Ed) 1990, Kautilya : The Arthashastra, New Delhi, Penguin

৬। Bangla Pedia- National Encyclopaedia of Bangladesh. http:// en.banglapedia.org/ index.php?title=Basak,_Radhagovinda

৭। Kar, Sanjoy (2021). An Annotated Bibliography of Professor Radhagovinda Basak (1885-1982). Library Philosophy and Practice [submitted]

৮। Kar, Sanjoy (2021). Bio-bibliometric Portrait of Vidyāvācaspati Prof. Radhagovinda Basak- a Sanskrit Pandit, Historian and Indologist, Library Philosophy and Practice [submitted]

৯। Mark, J. J. (2020, June 23). Arthashastra. Ancient History Encyclopedia. Retrieved from https://www.ancient.eu/Arthashastra/

১০। Presidency College, Calcutta (1956). Centenary volume- 2, The Records of the College 1955. Calcutta: West Bengal Government Press. xiv, 372p.

১১। Ray, Dinesh Chandra (2015). Varendra research society: its vision and mission (1910-1963) (Doctoral dissertation, University of North Bengal). http://14.139.211.59/bitstream/123456789/1866/14/14%20 Chapter-III.pdf

১২। The Bombay Chronicle (31 August, 1932). North Bengal under the Guptas: light on fifth century civilization. 8-8.